খালেদা

মহিউদ্দিন আহমদ

অনন্যা

ভূমিকা

২০১৪ সালের কথা। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল নিয়ে লেখার চেষ্টা করছি। শুরুটা জাসদ নিয়ে। এ নিয়ে কাজ করতে করতে মনে হলো, আওয়ামী লীগ আর বিএনপি নিয়েও লিখব। তাহলে রাজনৈতিক দলের একটা ট্রিলজি হবে। আমি খুবই উৎসাহ বোধ করছি। আমাদের এই অঞ্চলে মানুষ রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করে খুব বেশি। আর রাজনীতি হয় দলকে কেন্দ্র করে। একটা দলের ইতিহাস মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাস। অনেক চাপা পড়া ইতিহাস খুঁজে পেতে রাজনৈতিক দলগুলো একেকটি জানালা হিসেবে কাজ করে। জাসদ নিয়ে লেখার সময় আমি উনিশ'শ ষাট ও সত্তর দশকের একটা ছবি খুঁজে পাই।

জাসদের উত্থানপতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি বইটি প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালের অক্টোবরের শেষ দিন। বইটি পাঠকপ্রিয় হতে সময় নেয়নি। ফলে আমার মধ্যে রাজনৈতিক দল নিয়ে কাজ করার একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা তৈরি হয়। ওই সময় দেশে একটা নির্বাচন হয়েছিল। আওয়ামী লীগ তখন রাষ্ট্রক্ষমতায়। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিল বিএনপি। আওয়ামী লীগ সরকার যে করেই হোক একটা নির্বাচন করিয়ে নিতে মরিয়া। বিএনপি শুধু নির্বাচন বর্জনই করেনি, দলটি নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের যে সনাতন ভাষা, সেটাই তারা ব্যবহার করে। তাদের ডাকে চলতে থাকে বিক্ষোভ সমাবেশ, ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। একদিকে বিএনপির আন্দোলন, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের আন্দোলন দমন করার নানান চেষ্টা। সবটা মিলিয়ে পরিবেশ হয়ে ওঠে সংঘাতময়। সংঘর্ষে প্রাণ হারায় অনেকে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে আমি বিএনপি নিয়ে লিখতে শুরু করি। আমার ইচ্ছা বিএনপির জন্ম ও বেড়ে ওঠা নিয়ে দলীয় সাহিত্যের বাইরে একটি তথ্যনির্ভর বই লেখা।

লিখতে লিখতে মনে হলো, শুধু দলের দলিল আর খবরের কাগজ ঘেঁটে তো পুরো ইতিহাস ছেঁকে তোলা সম্ভব নয়। সেজন্য দলের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। তাঁর একটি সাক্ষাৎকার না নিলে তো এই দলটি নিয়ে লেখাজোখা থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া তো সহজ নয়। তিনি একটি বড় দলের নেতা। একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করেছেন। তাঁর স্বামী জিয়াউর রহমানও এক সময় রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। এরকম একটি পরিবার দেশে আর নেই। আমি নগণ্য লেখক। আমাকে তাঁর চেনার কথা নয়।

আমি আমার সীমিত সামর্থ্য দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। দু'একজনের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁরা আমার প্রতি আগ্রহ দেখালেন। চেয়ারপার্সনের সঙ্গে কথা বলে আমার একটি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ঠিক করা হলো। জীবনে এই প্রথমবার বিএনপির কোনো অফিসে আমি গেলাম।

২০১৫ সালের ২৩ আগস্ট সন্ধ্যেবেলা। আমি হাজির হলাম বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার গুলশান অফিসে। তাঁর একজন সহকারী আমাকে তাঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। ওই ঘরে যেতে হলে জুতা এবং মোবাইল ফোন বাইরে রেখে আসতে হয়। জুতার ব্যাপারটা বুঝি, এতে অনেক ধুলাবালি, ময়লা-আবর্জনা থাকে। জুতা বাইরে রেখে ঘরে প্রবেশ করার রীতি আমাদের সমাজে অনেক পুরনো। আমার বাসায়ও এই নিয়ম। অনেকেই অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু কিছুই করার নেই। আমার তো একডজন চাকর-বুয়া-বেয়ারা-আরদালি নেই যে, তারা বারবার এসে ঘর সাফ করে দেবে। শৈশবেই শুনেছি–পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। আমি পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করি।

মোবাইল ফোন তো আমাদের জীবনের অংশ হয়ে আছে। এটি ছাড়া যেন এক মুহূর্তও আমাদের চলে না। শুনেছি অনেক দলের মধ্যে সরকার তার লোক ঢুকিয়ে দেয়। তাদের কাজ হলো ভেতরের খবর ফাঁস করে দেওয়া। মোবাইল ফোন 'অন' করে যেকোনো আলোচনা বা বৈঠকের কথোপকথন রেকর্ড কিংবা লাইভ প্রচার করা যায়। দেখা গেছে, দলের মধ্যকার কোনো গোপন আলোচনা বা সিদ্ধান্তের খবর সরকারের কাছে পৌঁছে গেছে। এতে দল অসুবিধায় পড়ে। সেজন্যই এই সতর্কতা– চেয়ারপার্সনের ঘরে ঢুকতে হলে সঙ্গে মোবাইল ফোন থাকা চলবে না। নিয়মটা আমি জানতাম।

আমি সচরাচর স্যান্ডেল পরি। আমি স্যান্ডেল খুলে দরজার পাশে রাখলাম। পকেটে হাত দিলাম মোবাইল ফোনটা বের করতে। চেয়ারপার্সনের সহকারী বললেন, এ নিয়ম আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়, আপনি স্যান্ডেল পায়ে মোবাইল নিয়ে স্বচ্ছন্দে ভেতরে যেতে পারেন।

আমি পর্দা ঠেলে তাঁর কামরায় ঢুকলাম। ছোট একটা ঘর। মেঝেতে কার্পেট নেই, সাধারণ একটা ম্যাট। আসবাব বলতে শুধু একটা মাঝারি আকারের সেক্রেটারিয়েট টেবিল। দেওয়ালের দিকে একটি চেয়ারে বসে আছেন চেয়ারপার্সন। উল্টোদিকে তিনটি চেয়ার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য। এক কোণে বিশ ইঞ্চি মাপের একটা টেলিভিশন। সম্ভবত সময় কাটাতে তিনি এটি দেখেন।

এটি একটি বাসাবাড়ি। তারই একটি বেডরুম হয়তো এটি, যেটাকে একটা অফিস রুম হিসেবে সাজানোর চেষ্টা হয়েছে। খুবই নিরাভরণ এবং অনাড়ম্বর। নেতাদের অফিস বা বাসায় বসার জন্য যেরকম সিংহাসন দেখি, এ ঘরে সেসব নেই। আগে শুনেছিলাম, তিনি খুব বিলাসী জীবনযাপন করেন। এই ঘরে তার কোনো চিহ্ন দেখলাম না।

আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকি, তখন রাত আটটা-সাড়ে আটটা হবে। তিনি চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখে স্মিত হেসে বসতে বললেন। আমি তাঁর সামনে রাখা তিনটি চেয়ারের মাঝেরটায় বসলাম, একেবারে তাঁর মুখোমুখি। আমাদের মধ্যে দূরত্ব বড়জোর তিন ফুট চওড়া একটা টেবিল। এ দেশের রাজনীতির যাঁরা সামনের কাতারে বা যাঁদের বলা হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাঁদের কারও সামনে বসে কথা বলার অভিজ্ঞতা আছে আমায় অনেক বন্ধু ও পরিচিতজনের। আমার জন্য এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। ১৯৭০ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগ অফিসে প্রায়ই যেতাম। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের কামরায় আমাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তখন তিনি আমাদের প্রধান নেতা। তবে তাঁর সামনে চেয়ারে বসার সুযোগ ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতাম, তাঁর কথা শুনতাম। সেই স্মৃতি এখনো রয়ে গেছে।

বড় নেতাদের পিছু পিছু ঘোরা বা কারণে অকারণে তাঁদের নজরকাড়ার মতো ব্যক্তিগত আগ্রহ আমার কোনোকালেই ছিল না। খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেছি অন্য একটি কারণে। তাঁর দল নিয়ে লিখব। তাই তাঁর কোনো মতামত পেলে আমার কাজে লাগবে। এখানে আমি দর্শনার্থী বা স্তাবক নই, আমি শুধুই একজন লেখক।

চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া বসে আছেন। তাঁর পরনে গোলাপি শাড়ি। সম্ভবত জর্জেট বা শিফন। শাড়ি আমি তেমন চিনি না। তবে ওই শাড়িতে তাঁকে খুব উজ্জ্বল লাগছিল। মাথায় ঘোমটা ছিল না। ছবিতে এমন দেখা যায় না।

তাঁর বয়স কত হবে? আমি যেদিন তাঁকে সামনাসামনি দেখি, তখন তাঁর বয়স সত্তর। পড়ন্ত বিকেলে রোদের তেজ কমে গেলে একটা শান্ত সমাহিত ভাব জেগে ওঠে। তাঁর মুখটা অবিকল সেরকম।

চেয়ারপার্সনের রূপের প্রশংসা অনেক শুনেছি। এবার দেখছি কাছে থেকে। আসলেই তিনি সুন্দর। অবশ্যই তিনি একজন সফল রাজনীতিবিদ। একজনের রাজনীতির সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে ওই ব্যক্তি তার চূড়ায় উঠতে পেরেছেন কি না। খালেদার শুরুটাই হয়েছে নেতৃত্বের শীর্ষে থেকে। কিন্তু ক্ষমতার কাঠামোর চূড়ায় তিনি পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। এটা তাঁর 'গুণ' বলা যেতে পারে। রূপ আর গুণের এই রাজজোটক পৃথিবীতে খুব কম আছে। রূপকথায় আছে অনেক।

এদেশে সফল রাজনীতিবিদ অনেকেই আছেন। তাঁরা কেউ কেউ ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাতে পেরেছেন। আবার অনেক সুদর্শন নারী-পুরুষকে জানি, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে কিংবদন্তি হয়ে আছেন। সুচিত্রা সেন থেকে সোফিয়া লরেন, অনেকেই আমাদের কৈশোর-যৌবনের ক্রাশ। রাজনীতিতে এমনটা খুব বেশি দেখা যায় না। আমাদের দেশে সুন্দর মুখের নেতা আমরা দেখি শেখ মুজিবের মধ্যে। তারপর দেখলাম খালেদা জিয়াকে। ভারতে ছিলেন প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা।

শুরু হলো আমাদের কথাবার্তা। আমি বললাম আপনার দলের ইতিহাস লিখছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা না বলে তা কী করে হয়। তিনি বললেন– আমি কী জানি? দলের জন্মের সময় তো আমি ছিলাম না। ওই সময়ের কথা কিছু বলতে পারব না। বললাম, আপনি এখনকার কথা বলুন, সামনের দিনগুলোর কথা বলুন। বলুন, বিএনপির ভবিষ্যৎ কী। তিনি একটু থমকে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি একটি ছোট দলের বড় নেতা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করলেন। তারপর বললেন– থাক, এসব কোট করার দরকার নেই।

এভাবেই কথা এগোচ্ছে। তাঁর দলের অনেক নেতা বাইরের ঘরে ভিড় করেছেন। তাঁরা চেয়ারপার্সনের সাক্ষাৎ চান। কেউ কেউ দু'তিন দিন ধরে অপেক্ষায়। তাঁর সহকারী এসে আমাকে একটু তাড়া দিলেন। চাইলে আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বেরোবার সময় বললাম, বই প্রকাশিত হওয়ার পর আবার আসব।

তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা অনেকে জড়ো হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দলের বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাও আছেন। তাঁদের এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি– এটা ভেবে আমার খারাপ লাগল।

বিএনপি:সময়-অসময় নামে আমার বইটি প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তখন ঢাকায় চলছে একুশে বইমেলা। আগেরটির মতো এই বইটিও পাঠকরা গ্রহণ করলেন। মেলা শেষ হওয়ার পর আমি চাইলাম বইটির একটা কপি নিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে যাব। আবারও দিনক্ষণ ঠিক হলো। ২০১৬ সালের এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় আমি আবার হাজির হলাম গুলশানে চেয়ারপার্সনের কাছে।

যথারীতি আমি তাঁর কামরায় ঢুকলাম। তাঁর এক সহকারীও ঢুকলেন আমার সঙ্গে। ভেতরে তিনি বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম।

আমি বইটি দিলাম তাঁর হাতে। বইটিতে বিএনপি সম্পর্কে বেশকিছু সমালোচনা আছে। এজন্য দলের কট্টরবাদীরা অনেকেই আমার ওপর নাখোশ। তবে অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা আমার কাজের প্রশংসা করে বলেছেন– আর কেউ তো দলের ইতিহাস লিখল না, আপনি লিখলেন, এজন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি ধরেই নিয়েছি, চেয়ারপার্সন বইটি আগে পড়েননি বা দেখেননি। সহকারী বললেন– ম্যাডাম, আমাদের পক্ষে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। চেয়ারপার্সনের তাৎক্ষণিক জবাব– আমাদের পক্ষে লিখতে হবে কেন? যা সত্য, উনি সেটাই লিখবেন। এ কথা শুনে আমি যুগপৎ স্বস্তি ও আনন্দ পেলাম। বইটি তাঁর সামনে মেলে ধরে আমি কয়েকটা পৃষ্ঠার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমানের একটা ছবি দেখিয়ে বললাম– এটা বোধহয় আগে দেখেননি। তিনি বললেন, ছবিটি তিনি আগেও দেখেছেন।

বইয়ের শেষে দেওয়া আছে তথ্যসূত্র। সঙ্গে আছে সাক্ষাৎকারদাতাদের নাম। তিনি একটু চোখ বুলালেন। সেখানে কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান বিএনপি নেতার নাম আছে– আরিফ মঈনুদ্দীন, এম শামসুল ইসলাম, কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

এক পর্যায়ে আমার মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গেল– আমি আপনার বায়োগ্রাফি লিখতে চাই। হঠাৎ করে কেন এ কথা বললাম, জানি না। এরকম কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। তিনি আমার দিকে কৌতূহলভরা চোখে তাকালেন। কথাটা যখন বলেই ফেলেছি, তখন একটু গুছিয়ে আমার উদ্দেশ্যের পক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরা দরকার। বললাম, আপনি ছিলেন গৃহবধূ। একাত্তর সালে আপনার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। তারপর আপনি ছিলেন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী। প্রেসিডেন্টের নির্মম মৃত্যু হলো। আপনি হঠাৎ করে রাজনীতিতে এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। আপনাকে নিয়ে একটি বই লেখা যায়।

তারপর একটু থেমে বললাম, লিখতে হলে আপনার সাক্ষাৎকার নিতে হবে। একটি-দুটি নয়, অনেকবার। প্রথাগত প্রশ্নোত্তর নয়, মন খুলে কথা বলতে হবে। আপনাকে নিয়ে মানুষের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আমার প্রস্তাবটি লুফে নিলেন। বললেন, খুব ভালো হবে। তবে অফিসে বসে সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনেক ঝামেলা। এটা হতে হবে তাঁর বাসায়। তিনি হেসে বললেন–জীবনী লেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তো আমি নই। মনে হলো, এটা তাঁর বিনয়।

সেদিনের মতো কথা শেষ হলো। আমি উঠলাম। কিন্তু খালেদা জিয়াকে নিয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। আরেকদিন গেলাম তাঁর অফিসে। এবার লক্ষ্য হলো, সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাঁর সুবিধা অনুযায়ী একটা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা–কবে, কখন, কোথায়। পারলে ওইদিনই কাজ শুরু করা।

আমি যখন তাঁর কামরায় ঢুকি, তাঁর চোখ তখন টেলিভিশনের পর্দায়। কী একটা প্রোগ্রাম দেখছেন। তাঁর মধ্যে একটা ব্যস্ততা ছিল। খুব চিন্তিত মনে হলো। বললেন– এখন তো সময় দিতে পারব না।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। চলে এলাম। কিন্তু লেগে থাকলাম। এভাবেই দিন যায়, মাস যায়। আমার কাছে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তাঁর কাছে তার অগ্রাধিকার না-ও থাকতে পারে। তাঁকে একটা বড় দল সামলাতে হয়। তারপর আছে সরকারকে সামাল দেওয়া। এভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা সচল হলো–দুর্নীতির মামলা। তাঁকে আদালতে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। শেষমেশ তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁর আর সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো না। তারপর তো তিনি অসুখে পড়লেন। ঘনঘন হাসপাতালে যাওয়া, বাসায় বিশ্রাম নেওয়া, আবার হাসপাতাল। এভাবেই চলছে জীবন। মাথার উপর ঝুলছে আরও মামলা।

উনিশ'শ আশির দশক থেকে যে কয়জন আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন বা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার তালিকার শীর্ষে আছেন তিনজন– হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা। তিনজনকে নিয়েই বই লেখা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন গত হয়েছেন, একজন পলাতক এবং একজন সদ্য কারামুক্ত। আমি ভাবলাম, খালেদাকে নিয়ে শুরু করব।

খালেদাকে নিয়ে উপন্যাসের মতো করে একটি গ্রন্থ রচনা করা যায়। অবধারিতভাবে তাতে রাজনীতি আসবেই। মুশকিল হলো, আমাদের দেশের পাঠকদের একটা অংশ ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী। তাদের পছন্দ নেতাকে নিয়ে বন্দনাগীতি। কিন্তু প্রতিপক্ষের চোখে তিনি দানব। তার সবটাই খারাপ। এই দুই দলের দুই ধারার পাঠকের প্রশ্ন হলো– এই যে তথ্য দিলেন, এর সূত্র কী। অর্থাৎ কিছু লিখলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, এই তথ্য নির্ভুল। এটা মনগড়া কেচ্ছা নয়। সেজন্য ব্যবহার করতে হয় রেফারেন্স। আর রেফারেন্স ব্যবহার করলে উপন্যাসের মেজাজ থাকে না। নিজেকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে তাই শেষমেশ রেফারেন্স-কন্টকিত একটি রচনা লিখতে হলো।

৪

জন্মের পর মা-বাবা আদর করে ডাকতেন 'পুতুল'। পোশাকি নাম হলো খালেদা খানম। বিয়ে হলো সেনাবাহিনীর এক তরুণ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। নাম তাঁর জিয়াউর রহমান। সচরাচর মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে যা হয়, বিয়ের পর স্বামীর নামের অংশ নিয়ে তাঁর নাম হলো খালেদা জিয়া।

নামের অংশ না হলেও নামের সঙ্গে ভারিক্কি একটি শব্দ জুড়ে দেওয়ার রীতি আছে আমাদের সমাজে। বিশেষ করে যাঁরা সমাজের একটু উঁচু পর্যায়ে চলে যান, তাঁদের নামের সঙ্গে সম্মানসূচক দু-একটা শব্দ বসাতে হয়। এক সময় সেটিও নামের অংশ হয়ে যায়। এভাবেই খালেদা হয়ে উঠলেন বেগম খালেদা জিয়া।

স্বামী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রমানের সঙ্গে খালেদা জিয়া

পুতুল থেকে বেগম খালেদা জিয়া হয়ে ওঠার পরিক্রমা মসৃণ ছিল না। তবে তাতে চমক ছিল। দিনাজপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী খালেদা খানম যে এক সময় এদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং পরে তাঁর ঠাঁই হবে জেলখানায়–এটা কে ভেবেছিল? তাঁর জীবনের এই উত্থানপতনের আখ্যান তুলে আনাটা মোটেই সহজ নয়।

ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে খালেদার বিয়ে ছিল তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল। খালেদার তখন কৈশোর কাল। তাঁর রূপের খ্যাতি পৌঁছে গেছে শহরের ভেতরে বাইরে। তাঁর কথা কানে গেল জিয়াউর রহমানের।

খালেদার বেড়ে ওঠা দিনাজপুর শহরে। ওই শহরেরই একজন জমির উদ্দিন সরকার। আইনজীবী হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন। পরে তিনি হয়েছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার। তিনি জানতেন, খালেদা দেখতে খুবই সুন্দর। এ নিয়ে তাঁর একটি অন্তরঙ্গ বর্ণনা আছে। 'দ্য পলিটিক্যাল থট অব তারেক রহমান' নামের এক বইয়ে একটি রচনায় তিনি লিখেছেন :

> তিন বোনের মধ্যে খালেদা সবচেয়ে সুন্দর। ওই সময় বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ঘরে ঘরে তাঁকে নিয়ে একটা খবর রটেছিল: একদিন এক ঘটক এক পাত্রীর সন্ধান নিয়ে গেলেন জিয়াউর রহমানের কাছে। জিয়াকে তিনি বললেন, 'আপনি যদি তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হন, তাহলে আপনার বাড়িতে বিজলিবাতির দরকার হবে না। পাত্রী এত রূপসী যে, তাঁর রূপের ছটায় সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।' জিয়া হাসলেন এবং বিয়ে করতে সম্মত হলেন। তারপর দুজন সুখের নীড় বাঁধলেন।

৫

অনেকের মতো খালেদার জীবনেও এসেছিল ১৯৭১ সাল, যার ঝাঁপটায় তাঁর জীবন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। এটা বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে ২৫ মার্চের সেই রাতে।

২৫ মার্চ মাঝরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষ ছিল দিশেহারা। ঠিক ওই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ করেন। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। সবচয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে চট্টগ্রামে, যা ছিল অভূতপূর্ব। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়নের সকল বাঙালি সদস্য পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ান। পুরো একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে বিদ্রোহ করার উদাহরণ একাত্তরে আর নেই।

বিদ্রোহ করে বাঙালি সৈন্যরা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসেন। ওই সময়ের ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও অংশগ্রহণকারীদের ভাষ্য জানা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি তখন আওয়ামী লীগ নিয়ে কাজ করছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বটি বোঝার জন্য আমি শরণাপন্ন হই অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওই সময়ের কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (পরে কর্নেল, রাজনীতিবিদ), ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান (পরে ব্রিগেডিয়ার, রাষ্ট্রদূত) এবং লেফটেন্যান্ট সমশের মুবিন চৌধুরীর (পরে মেজর, পররাষ্ট্রসচিব)। তাঁদের কাছে জানতে পারি, মেজর জিয়াউর রহমানের কমান্ডে তখন ৩০০ বাঙালি সৈন্য। ২৬ মার্চ ভোরে (২৫ মার্চ দিবাগত রাতের শেষ প্রহরে) তাঁরা রেজিমেন্টের ইউনিট লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। রেললাইন ধরে তাঁরা হেঁটে যাচ্ছেন পটিয়ার দিকে। সমশের মুবিন চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন :

> মেজর জিয়া বললেন, শহরে থাকা যাবে না। ৩০০ মাত্র সৈন্য আমাদের। থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে কীভাবে যুদ্ধ করবেন? কালুরঘাট ব্রিজ পার হয়ে নদীর অপর পারে গেলাম। এত রাত, কীভাবে যাব? রেললাইন ধরে যাব। তাহলে রাস্তা হারানোর কোনো ভয় নাই।
>
> রেললাইন দিয়ে যাচ্ছি। মেজর জিয়া সৈন্যদের বললেন, আমরা বড় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে যাচ্ছি। তোমরা আমাদের সাথে আছ? সবাই বলল, আছি। রেললাইন মেজর জিয়ার বাসার ঠিক পাশ দিয়ে। সেখানে যখন গেলাম, বললাম, স্যার, আপনি চলে যাচ্ছেন, ভাবি আর বাচ্চারা তো বাসায়। উনার ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই– অন দ্য স্পট উই আর অল সোলজার্স। আই অ্যাম দ্য লিডার। সো অ্যাবাউট দ্য ফ্যামিলিজ অব থ্রি হান্ড্রেড ম্যান কামিং উইল আস। ইফ আই ক্যান নট প্রটেক্ট দেয়ার ফ্যামিলিজ, আই শুড নট প্রটেক্ট মাইন (এখানে আমরা সবাই সৈনিক। আমি নেতা। আমাদের সঙ্গে আসা ৩০০ জনের পরিবারের কথা ভাবো। আমি যদি তাদের পরিবারগুলোকে নিরাপত্তা দিতে না পারি, তাহলে আমার পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়াও উচিত নয়।)
>
> এই যে একটা চরম স্যাক্রিফাইস করার ক্ষমতা, এটা না হলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হতো না, এটা না হলে মাও সে তুং হতো না, এটা না হলে নেলসন ম্যান্ডেলা হতো না, এটা না হলে মহাত্মা গান্ধী হতো না। এবং এটাও ঠিক, শেখ মুজিব হতো না।
>
> এই যে কথাটা, ইফ আই ক্যান নট লুক আফটার দেয়ার ফ্যামিলিজ, আই ক্যান নট লুক আফটার মাই ফ্যামিলি। দ্যাটস অল। হি ইজ ইকুয়েটিং হিজ স্ট্যাটাস উইথ দ্য স্ট্যাটাস অব এ কমন সোলজার। দিজ ইজ হোয়াট মেকস হিম আ লিডার।

জিয়াউর রহমান সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলেন পটিয়া। ঘরের ভেতরে তাঁর স্ত্রী খালেদা দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিদ্রাহীন রাত কাটালেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি কি জিয়ার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন? এ নিয়ে তিনি কখনো মুখ খোলেননি। তবে বোঝা যায়, এটি তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। তিনি আজ এখানে, কাল সেখানে– এভাবে ঘুরে ঘুরে একসময় ঢাকায় আসতে সক্ষম হলেন। সঙ্গে দুটি শিশুসন্তান। ছোটটি তখনো হাঁটতে শেখেনি। জিয়াউর রহমান তখন ভারতে। তিনি একটি ব্রিগেড গঠনের চেষ্টা করছেন, পরে যেটি 'জেড ফোর্স' নামে পরিচিতি পায়। শোনা যায়, তিনি খালেদাকে ভারতে নিয়ে আসার জন্য চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। তাঁর লোকেরা খালেদাকে খুঁজে পায়নি, কিংবা খালেদা নিজেই ভারতে যেতে অস্বীকার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেই না গিয়ে থাকেন, তাহলে এখানে দুটো বিষয় জড়িত থাকতে পারে। প্রথমত, তিনি দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে অনিশ্চিত পথ পাড়ি দিতে চাননি। তাঁর কাছে সন্তানের নিরাপত্তাই ছিল মুখ্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর খোঁজ না নিয়ে জিয়ার চলে যাওয়াকে তিনি ভালোভাবে নিতে পারেননি। তাঁর মনে তীব্র অভিমান ও ক্ষোভ জন্মেছিল। আসলে কী হয়েছিল, জানি না। এ সবই অনুমানের কথা।

২ জুলাই ১৯৭১ মৃত্তিকা জরিপ দপ্তরের প্রকৌশলী এস কে আবদুল্লাহর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন খালেদা। দুই শিশুপুত্রসহ তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসে আটকে রাখা হয়। এর আগে খালেদাকে ভারতে চলে আসার জন্য ডা. হুমায়ুন আবদুল হাইকে দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন জিয়া। চিঠিটি ছিল খালেদার বড় বোন খুরশিদ জাহান হকের স্বামী মোজাম্মেল হকের উদ্দেশে। এটি জিয়ার হাতের লেখা কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য চিঠিটি খালেদাকে দেখানো হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হন। মোজাম্মেল হক এবং এস কে আবদুল্লাহও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁদের উপর নির্যাতন চালানো হয়।

৬

যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত খালেদা ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি ছিলেন। এ নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকেরা অনেক কেচ্ছা প্রচার করেছেন। একাত্তরের অবরুদ্ধ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন নিয়ে স্থূল রসিকতা করার মতো রুচিহীন মানুষের অভাব নেই এই সমাজে। এমন কথাও চাউর হয়েছিল, খালেদার ওই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ে জিয়ার সঙ্গে তাঁর তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। এ নিয়ে একটি মুখরোচক ভাষ্য পাওয়া যায় এম এ ওয়াজেদ মিয়ার লেখায়।

ওয়াজেদ মিয়ার একটি লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় দৈনিক *আজকের কাগজ* পত্রিকায়। সেখানে একাত্তর ও তার পরবর্তী অনেক ঘটনাবলির উল্লেখ ছিল। সেখানে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর ভাষ্যে জানা যায়, খালেদার সঙ্গে জিয়ার সম্পর্ক খুব খারাপ। জিয়া তাঁকে ঘরেই রাখতে চান না– এমন অবস্থা। খালেদা অনন্যোপায় হয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাছে নালিশ দেন। শেখ মুজিব জিয়াকে ডেকে ভর্ৎসনা করেন। ব্যাপারটা এভাবেই মিটে যায়।

আজকের কাগজে প্রকাশিত ওয়াজেদ মিয়ার ধারাবাহিক রচনা নিয়ে পরে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে ইউপিএল *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* শিরোনামে বইটি প্রকাশ করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ওয়াজেদ মিয়ার এ বইয়ে খালেদা সম্পর্কিত ওই ঘটনাটির উল্লেখ নেই। এখানেই প্রশ্ন। তিনি কি মনগড়া কেচ্ছা লিখেছিলেন, নাকি বিষয়টির সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে বই প্রকাশের সময় এটি বাদ দেন? তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেননি। উল্লেখ্য, খালেদার সঙ্গে ওয়াজেদ মিয়ার সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৯১ সালে খালেদা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ওয়াজেদ মিয়াকে পরমাণু শক্তি কমিশনে উঁচু পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ওয়াজেদ মিয়া দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন, এমনকি ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়েও।

৭

১৯৮৫ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পরপর তিনটি সেনা অভ্যুত্থানে দেশের চালচিত্র পাল্টে যায়। ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে যান জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) নামে তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। বিএনপির হাল ধরেন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার। ১৯৮২ সালের মার্চে এক সেনা অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতা হারান। রাষ্ট্র চলে যায় সেনাপ্রধান এইচ এম এরশাদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৮২ সালে খালেদা যোগ দেন বিএনপিতে। শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক পথপরিক্রমা।

প্রয়াত জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী হিসেবে তিনি বিএনপিতে মর্যাদার আসন পান। কিন্তু তিনিও যে একজন নেতা হতে পারেন, এটি তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন ৯ বছরব্যাপী এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে। তৈরি

হয় তাঁর 'আপসহীন' ব্যক্তিত্ব। এর সুবিধা পান তিনি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর দল জাতীয় সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। খালেদা হন এদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। এভাবেই ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়।

পরবর্তী দশ বছর ছিল ঘটনাবহুল। এ সময় তিনি সংসদ নেত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী, উভয় ভূমিকারই স্বাদ নেন। তারপর তিনি আবার সরকার গঠন করতে সক্ষম হন। তবে শেষ মেয়াদটি তাঁর জন্য ভালো ছিল না। প্রথম মেয়াদে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকে। আজ যিনি সরকারে, কাল তাঁর স্থান হতে পারে বিরোধী দলের বেঞ্চে। সংসদীয় গণতন্ত্রে এটি আকছার হয়ে থাকে। এই সহজ সরল সত্যটি আমাদের দেশে অনেকেই বুঝতে চান না। দীর্ঘ মেয়াদে কিংবা আজীবন ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে পছন্দ করেন কেউ কেউ। তাঁরা নানান কৌশল নেন, ছক কষেন। কাজ করার আনন্দের চেয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার লোভ গ্রাস করে তাঁদের। খালেদার জীবনেও তাই ঘটে। তাঁর কৌশল প্রতিপক্ষের কৌশলের কাছে মার খায়। তিনি বুঝতেই পারেননি, তাঁর চেয়েও চালাক খেলোয়াড় আছেন রাজনীতির পিচ্ছিল মাঠে। এই পরিস্থিতিতে আবারো হয় সেনা অভ্যুত্থান–এক এগারো। সেই যে তিনি ক্ষমতার বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়লেন, আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না।

খালেদার শেষ জীবনটা বিয়োগান্ত। তিনি মামলার জালে পড়েন। গ্রেপ্তার হন। শাস্তি পান। যেতে হয় কারাগারে। সরকারের নির্বাহী আদেশে তিনি জেল থেকে ঘরে আসেন। তবুও তিনি বন্দি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই তিনি রাজনীতিতে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। তিনি অসুস্থ। বাসা আর হাসপাতালের মধ্যেই তাঁর আনাগোনা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পালাবদল হলে তিনি সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পান।

৮

শুরুতে তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তাঁর জীবনী লিখব। আসলে আমি যে কাজটি করতে চেয়েছি, তা হলো, তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক জীবনীগ্রন্থ তৈরি করা। তবে জীবনীতে সচরাচর যে বিস্তারিত বর্ণনা থাকে, আমি সেটি পারিনি, করিনি। আমি চেয়েছি রাজনীতির খালেদাকে তুলে আনতে। এখানে শুরুটা ১৯৮২ সালে তাঁর বিএনপিতে যোগ দেওয়া থেকে। শেষটা তাঁর গ্রেপ্তার হওয়া, ২৫ মাস জেলে থাকা ও অবশেষে মুক্তি। এই চার দশকে তাঁর জীবনে ঘটে গেছে নানান উত্থান-পতন। এর মধ্যে অনেক গল্প আছে।

খালেদা সম্পর্কে লিখতে গেলে প্রাসঙ্গিক অনেক কিছু এসে পড়ে। রাজনীতি তো তিনি একা করেননি। মাঠে তাঁর প্রতিপক্ষ আছে। তাঁরা প্রবল। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কটা সংঘাতময়। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির চর্চায় দয়া-মায়া-মহানুভবতার স্থান নেই। একসময় তাঁকে রাজরানী মনে হতো। প্রতিহিংসার রাজনীতির স্বীকার হয়েছেন তিনি। বইটিতে উঠে এসেছে ওই সময়ের কথা।

বইটি লিখতে গিয়ে অনেক সূত্র ঘেঁটেছি। অনেক পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করেছি। অনেক জায়গায় স্বল্প ও দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকজন নানাভাবে আমাকে বইপুস্তক ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন মোস্তাফা জব্বার, খোদা বকশ চৌধুরী, বিজন কান্তি সরকার ও সরদার আবদুল মতিন। পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করতে সাহায্য করেছেন প্রিতম আদনান। বইটি প্রকাশে আগ্রহ দেখিয়েছেন অনন্যা'র স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলো নিয়েছি সমসাময়িক পত্রিকা ও ইন্টারনেট থেকে।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com